ইকবাল হাসান

দুঃখ-কষ্টের গল্প

এতটা রোগাটে ছিল না আমাদের বিশখালি। বেশ টলটলে চেহারা ছিল একসময়। তবে রোদ-বৃষ্টি যাই হোক উজান-ভাটায় থমথম করতো মুখ। বড় অভিমান।

রাত্রি এলে অন্ধকারে দু'কূল তলিয়ে যেত, চোখের আড়াল হতো বনভূমি। তখন এপার-ওপারের ব্যবধান বোঝা কার সাধ্য। কিছুই দেখা যেত না। শুধু অন্ধকারের মানুষের দুঃখ-কষ্টের কুপিগুলো জ্বলত ছিটেফোঁটা নৌকায়।

এই ছিল বিশখালি, আমাদের বাড়ির একেবারে কাছে। বিশখালির পাশে আমি বড় হয়েছি, শুনেছি বাবাও। এক সময় মাছ ধরার শখ ছিল বাবার। এখন বার্ধ্যক্যের নিরীহ সময় যাচ্ছে তাঁর। কাঁধে জালে আর খারোই হাতে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টিতে যখন-তখন বেরিয়ে পড়ার মতো বয়স আর কোথায় পাবেন তিনি। অবশ্য আমরা এখন যেখানে থাকি সেখানে নদী নেই, জলের গন্ধ নেই। আছে গ্রিল দেয়া ব্যালকনি, ইউক্যালিপটাসের ঝিরঝিরে পাতা আর ঘাসের কার্পেট।

বাবা সারা দিন বসে থাকেন বারান্দায়। বৃষ্টির দিনে তাকিয়ে থাকেন প্রকৃতির দিকে, একদৃষ্টে। মাঝে মাঝে বলেন, তোর বৃষ্টিতে নদী দেখতে ভালো লাগে? নদী, মাছের গন্ধ, ফিরে এসে পুকুর ঘাটে জলকাদা লাগা পা ধোয়া, এইসব ভালো লাগে তোর? আমি কিছু বলি না। শুধু তাকিয়ে বাবাকে দেখি–মাথাভর্তি পাকা চুল, গর্তের ভেতরে ডুবে যাওয়া চোখের কুচকুচে মণিতে অপরাহ্নের খেলা। আমাকে নিশ্চুপ দেখে বাবা ধ্যানী মানুষের মতো বলতে থাকেন, জলের একটা আলাদা গন্ধ আছে। বৃষ্টিতে টের পাওয়া যায়।

আমি জলের ভেতর কোনো আলাদা গন্ধ পাই না শুধু বাবার একাকিত্বের কষ্টটুকু টের পাই আজকাল।

মা নেই সেই ছোটবেলা থেকে। পরীখালা, যাকে আমি দীর্ঘকাল মা বলে ডেকেছি–তিনি আসলে বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। বিয়ের আগে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি আসতেন এই পরীখালা। গল্প ফেঁদে বসতেন। তাকে আমার পছন্দ হতো না, এলেই ইনিয়ে-বিনিয়ে গল্প জুড়ে দিতেন মায়ের সঙ্গে–মাকে কাছে পেতাম না। কখনো আমাকে কাছে পেলে মার অগোচরে চোখ রাঙাতেন পরীখালা। ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতাম আমি।

মা জীবিত থাকতেই বাবা আর একবার হলুদ মেখেছিলেন। আমি তখন একেবারে ছোট। মনে পড়ে, বাবা সেদিন গাঁয়ের লোক জড়ো করেছিলেন। আমাদের উঠোনভর্তি লোক। বরযাত্রী যাবে পাশের গাঁয়ে–পরীখালাদের বাড়ি। বাবা ফিনফিনে পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে আসছিলেন, এমন সময় মা হঠাৎ কোত্থেকে ছুটে এসে বাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরে মাথা ঠুকতে লাগলেন। যারা এসেছিল সবাই স্তব্ধ হয়ে থাকল, কেউ সাহস পেল না কিছু বলার। মা উঠোন ভর্তি লোকের মাঝে চিৎকার করে কাঁদলেন। আমি সে কান্নার অর্থ বুঝতে পারিনি সেদিন।

গভীর রাতে বাবা টুকটুকে লাল পরীখালাকে নিয়ে এলেন। আর মা সারা রাত পুকুর ঘাটে বসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আমি তাঁর কান্নার ভেতর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মায়ের কোমল বুকে ঐ আমার শেষ ঘুম। পরদিন মাকে পাওয়া গেল বাড়ির দক্ষিণ দিকের পুকুরের জলে, শাপলা পাতার আড়ালে। ঠা া, হিম, ফ্যাকাশে ভয়ঙ্কর সাদা আমার মাকে ঐ আমার শেষ দেখা। সেই থেকে আমার কষ্টের শুরু।

আমার এক মামা ছিলেন টুনুমামা। ভয়াবহ রকম কালো আর বেঁটে। মাথার সব কটা চুল তার সাথে বিদ্রে করেছিল বোধ করি আমার জন্মের আগেই। এই টুনুমামা যখন ভুলক্রমে চুলের মধ্যে আঙুল চালানোর মতো করে নিজের মাথায় হাত বুলোতেন, আমরা মাটির দিকে মুখ নামিয়ে হাসতাম, নিঃশব্দে।

টুনুমামা সম্পর্কে আমার তখন সীমাহীন আগ্রহ। যদিও উনি আমাদের কেমন মামা তা জানতে পারিনি কোনোদিন। পরীখালা একদিন বলেছিলেন, তোর মামা, সালাম কর্। ব্যস, সেদিন থেকে টুনুমামা আমার মামা। বাবাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, বাবা ধমকে উঠেছিলেন। টুনুমামা সম্পর্কে আগ্রহ দেখালেই ধমকে উঠতেন বাবা, লাল হয়ে উঠত তার চোখ। রহস্য!

কোনো জিনিস নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করতে নেই, ভেঙে যায়। আমি টুনুমামার রহস্য ভাঙাতে চাইনি। বাবা থাকতেন শহরে, ছুটিছাটায় বাড়ি আসতেন, ফিরে যেতেন। টুনুমামা আসতেন নিয়মিত। তার আসা এবং নিঃশব্দে চলে যাওয়া দেখতাম আমি।

পরীখালা বড় ভালোবাসতেন এই টুনুমামাকে। তার হাসি-হাসি মুখে সে ভালোবাসা লেপ্টে থাকতো। একদিন, স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি, টুনুমামা খাচ্ছেন। পরীখালা বলছেন, আর একটু নাও। না খেয়ে খেয়ে শরীরটা তো শেষ করে দিয়েছ। তোমাকে নিয়ে যে কোথায় যাব।

আর একদিন, গভীর রাতে হঠাৎ জেগে দেখি, পরীখালা ঘরে নেই। ঘরের দরজা ভেজানো। আমি বেরুলাম, বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। কামিনী ঝোপের আড়ালে চাঁদ, একা। দূর থেকে মনে হলো, পুকুরঘাটে কারা যেন খুব কাছাকাছি বসে আছে। খুব ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে দেখি, পরীখালা। পাশে টুনুমামা! আমি নিঃশব্দে পেছনে দাঁড়ালাম, পরীখালা বলছে, আমার আর ভালো লাগছে না টুনু! খুব মন খারাপ লাগে আজকাল, আর পারি না। এই কথায় টুনুমামা পরীখালার গলা জড়িয়ে ধরলেন, মন খারাপ করে লাভ কী পরী?

টুনুমামার মাথার ওপর তখন নৃত্য করছিল জ্যোৎস্না। সেদিকে চোখ পড়তেই হাসি পেল আমার। সামান্য শব্দ হতেই টুনুমামা ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন, কে, কে?
কেউ নয় মামা, আমি রঞ্জু। তোমার সাহস দেখলাম।
কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত পরীখালা ঘরে ফিরে এলেন। আমার শয্যাপাশে সেই প্রথম এক অগ্নিমূর্তি দেখলাম। চুল ধরে টেনে তুললো আমাকে। তারপর গরুপেটা করল। জ্বর নিয়ে আমি তিন দিন বিছানায় পড়ে থাকলাম, চুপচাপ। একা।
সেই থেকে আমার দুঃখের শুরু।
এক বয়সে টুন্‌টুনিকে বড় ভালো লাগত আমার। ভারি ভালো মেয়ে ছিল আমাদের টুনটুনি। কৈশোরের ভালোলাগায় লাবণ্যের প্রয়োজন হয় না। ভালো লেগে যায়, তবু লাবণ্য ছিল এই টুনটুনির। দূর থেকে বোঝা যেতো না।
টুনটুনিকে আগলে রাখতেন টুনুমামা। একমাত্র মেয়ে। টুনুমামাকে বড় ভয় পেতাম। তবু মাঝে মাঝে টুনটুনির কাছে যেতাম আমি। বড় একা-একা থাকত। আমাকে দেখলে ওর কী যে আনন্দ হতো। নিচের ঠোঁটের সেই কাটা দাগটি আর চোখে পড়ত না তখন।
গত দুদিন আসোনি কেন? মুখ ভার করে থাকতো ও। অভিমান।
কখনো ঈষৎ বাঁকা হাতটি দিয়ে জড়িয়ে ধরত আমাকে। আমি ওর নিজের ঠোঁটের সেই কাটা দাগটির ওপর আঙুল ছোঁয়াতাম। ওর উজ্জ্বল হাসির বন্যায় ঐ অপ্রিয় সুন্দর কাটা দাগটি যেন নিছক খড়কুটোর মতো ভেসে যেত মুহূর্তে।
একদিন বিকেলের দিকে আমি গিয়েছি টুনুমামার বাড়ি। টুনুমামা ছিলেন না, টুনটুনি একা। বাইরে একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছিল, আমার শরীর ভেজা, চুল-চোখ-মুখ সব। টুনটুনি প্রায় দৌড়ে এলো। একটা লাল শাড়ি পরা ছিল ওর। আঁচল দিয়ে মুখ মুছল আমার। আঁচলের কিছু লাল বুঝি লেগে থাকল আমার মুখে। আমাকে টেনে নিয়ে এল ঘরে। বাইরে তখন মুশলধারে বৃষ্টি।
ঐদিন, সারা-বিকেল-সন্ধ্যা আমরা বৃষ্টির জলে ভাসলাম-ডুবলাম; আবার ভাসলাম, আবার ডুবলাম। যখন উঠব দেখি, দরজা অন্ধকার করে একজন দাঁড়িয়ে–টুনুমামা।
সেই থেকে আমার ব্যর্থতার শুরু।
বাবাকে দেখলে আজকাল আমার সেই দুঃখ-কষ্ট আর ব্যর্থতার কথা মনে পড়ে। শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি বড় মারাত্মক, নরম মাটিতে যেন দাগগুলো গেঁথে থাকে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শক্ত হয় সেই মাটি কিন্তু দাগ থেকে যায়। সহজে ওঠে না। বাবারও কি তাই? বাবা কি এখনো ধরে রেখেছেন মায়ের কথা, পরীখালার কথা? জানি না।
ক'দিন ধরে শরীরটা খুব খারাপ যাচ্ছিল আমার। এমন অনেক সময় আসে যখন কিছুই ভালো লাগে না। কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। ঘরেও বসে থাকতে চায় না মন। চার পাঁচ দিন বৃষ্টি গেল একটানা। এখন বেশ ঝরঝরে হয়েছে প্রকৃতি। গাছপালার সেই মন খারাপ করা ভাবটি নেই আর।
গতকাল বৃষ্টির মধ্যে টেলিফোন করেছিলেন মিসেস শাহেদ। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। বাতাসের সাথে বৃষ্টির ছাট এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল জানালার শার্সিতে। আমি ভাবছিলাম বাবার কথা। জীবনের অপরাহ্নে নিঃসঙ্গতা চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে বাবাকে। আমি তাঁকে কতটুকু সঙ্গ দিতে পারি। সারাদিন তো বলতে গেলে–অফিসে থাকি। তবু রমিজটা আছে বলে রক্ষে। পরীখালা টুনুমামার সঙ্গে চলে গেল–সেই থেকে ভয়াবহ রকম একা, নিঃসঙ্গ আমার বাবা। সারাদিন বসে থাকেন বারান্দায়, রমিজকে এটা ওটা নিয়ে ধমক দেন। আমি বাসায় ফিরলেই অভিযোগ। বয়স বৃদ্ধির সাথে মানুষ ধীরে ধীরে শিশুর স্বভাব পেতে থাকে। বাবা পরিণত শিশু হয়ে যাচ্ছেন ক্রমশ।
মিসেস শাহেদ বলল, কী করছ?
কিছু না। বৃষ্টি দেখছি।
আসবে? একদম একা বসে আছি।
কেন, সাহেব কোথায়?
চট্টগ্রাম। ফিরবে চার দিন পর।
আমাকে যদি টেলিফোনে না পেতে?
অন্য কাউকে নিশ্চয়ই খুঁজতাম না।
তোমাদের বিশ্বাস কি?
বহুবচনে বললে জবাব দিচ্ছি না। আমাকে বললে বলছি–জল-স্বভাব যে আমাতে নেই, কৃষ্ণের তা ভালোই জানা আছে।
তা রাধা বিবি, ভর দুপুরে বৃষ্টির ভেতর এই যে টেলিফোন করা হচ্ছে–আমাকে না পেলে এরকম অন্য কাউকেও তো করতে পারতে।
না, প্রশ্নই ওঠে না।
কেন?
কারণ, তুমি তুমিই। যাক আসবে।
দেখি।

দেখি না, আসো। শেষবারের মতো।
শেষবারের মতো মানে?
চলে যাচ্ছি। খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল মিসেস শাহেদ। কোথায়? আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।
বহু দূরে।
টেলিফোন রাখলো মিসেস শাহেদ।
বাসায় ফিরে দেখি, বাবা শুয়ে আছেন। তাঁর ঘরে ডিম লাইটের মৃদু আলো। আমি আমার ঘরের দিকে পা বাড়াতেই বাবা অনুচ্চস্বরে ডাকলেন, রঞ্জু ফিরলি?
হ্যাঁ বাবা। কিছু বলবে?
বাবার কাছ ঘেঁষে বসলাম আমি। মৃদু নীল মায়াবী আলোয় ছেয়ে আছে বাবার শরীর। বললেন, আর তো বেশিদিন নেই আমার। একটু গ্রামে যেতে চাই, নিয়ে যাবি?
গ্রামে গিয়ে কী করবে বাবা? সেখানে কিছু নেই। বিশখালির ভাঙনে সব গেছে। কাগজে ইরোশনের ছবি দেখনি?
তবু যাবো আমি। নিয়ে যাবি?
ঠিক আছে, যেও।
চারদিকে সোনালি পর্দার মতো দুলছে দুপুর। রোদের তেজ আছে বেশ। অফিস থেকে বেরিয়ে রিকশার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি বহুক্ষণ। কাঁধের কাছ থেকে সিলকের রুমালের মতো স্পর্শ দিয়ে যায় জ্যৈষ্ঠের বাতাস। ফুটপাত জুড়ে লাইন দিয়ে সাজানো ফলের দোকান। একটা মৌ-মৌ গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। মানুষের ভিড় চারপাশে। সবাই অপেক্ষা করছে - কেউ বাস, কেউবা রিকশার জন্য। এক একটা বাস আসছে আর হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়েছ অফিস ফেরত মানুষের ঝাঁক।
একবার একটি খালি স্কুটার দেখে চিৎকার করে উঠলাম। স্কুটারটা দূর থেকে হাত নাড়াল, যাবে না। মাঝবয়সি এক ভদ্রলোককে দেখলাম বাসের দিকে ছুটে যাচ্ছেন। সঙ্গে একটি কাপড়ের প্যাকেট। ভদ্রলোক প্রায় ধরে ফেলেছিলেন বাসের হ্যান্ডেল। কিন্তু না, ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন তিনি। আমার পাশে দাঁড়ালেন। ঘামে একেবারে লবজব অবস্থা। পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে লেপ্টে আছে পিঠের সঙ্গে। 'ধুস শালা' বলে ভদ্রলোক বাম হাতের খবরের কাগজ দিয়ে বাতাস খেতে লাগলেন।
ঠিক তক্ষুণি এলো একটি ডাবল ডেকার, ভিড় একটু কম। লোকজন নামছে, উঠবার পথে প্রচ ভিড়। অনেক কষ্টে সৃষ্টে প্রায় স্থূলকায় এক মহিলাও নামলেন সঙ্গে দুটি বাচ্চা। ডাবল ডেকারটি একটা বিশ্রী শব্দ তুলে চলে গেল। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি আমার পাশের সেই লবজব ভদ্রলোকটি নেই।
আমাকে পাশ কাটিয়ে পরপর কয়েকটি স্কুটারও গেল। দু' একটি রিকশাও। অবশেষে একটি রিকশা পেলাম আমি। ভাগ্য। উঠতে যাবো এমন সময় কেউ খুব কাছ থেকে নাম ধরে ডাকল। তাকিয়ে দেখি, বাস থেকে নেমে আসা সেই মহিলা। অপলক তাকিয়ে আছে আমার দিকে।
রঞ্জু না। আমি চমকে উঠলাম। ঠোঁটের সেই কাটা দাগটির ওপর স্থির হয়ে গেল আমার দৃষ্টি। আমার চোখের সামনে টুনটুনি। কতদিন, কতো মাস, কত বছর পর। কেমন আছ?
টুনটুনি দেখছে আমাকে।
ভালো তুমি?
দেখতেই পারছ।
টুনটুনি ব্যাগ থেকে ছোট্ট রুমাল বের করে ঘাম মুছল।
তোমার বাচ্চা?
দুটি বাচ্চা টুনটুনির দু'পাশে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিল।
হ্যাঁ, ইতু আর মিতু।
টুনটুনি বলল, তোমাকে এ সময় দেখব ভাবতেই পারিনি!
সেই কখন থেকে রিকশার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। চলো কোথাও বসি।
আমরা সামনে এগুতে থাকি। ছোট্ট বাচ্চাটির হাত ধরে টুনটুনি এগুচ্ছে নিঃশব্দে। বড়টি আমার পাশে পাশে হাঁটছে।
কোথায় থাকো তোমরা? আমি জানতে চাইলাম। কাছেই। যাবে?
আজ না; আরেক দিন। ঠিকানাটা দাও।
টুনটুনি ঠিকানা বলে, আমি মুখস্থ করে রাখি।
একটা রেস্তোরাঁর সামনে এসে দাঁড়াতেই বললাম, চলো একটু বসি।
না, বললো টুনটুনি, আজ তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। ও পথ চেয়ে বসে থাকবে।
টুনটুনির কথায় আমি বড় ব্যথিত হলাম। তবু বললাম, একটু বসি।

আজ থাক। টুনটুনি বলল, তুমি বরং আমার একটু উপকার করো। ইতু-মিতুকে নিয়ে একটু দাঁড়াও। আমি আসছি।
টুনটুনি মিতু-ইতুকে রেখে ফুটপাত ধরে সামান্য এগিয়ে গিয়ে ফার্মেসিতে ঢুকে পড়ে। ফিরে আসে হাতে একগাদা ওষুধ নিয়ে। ঈষৎ বাঁকানো হাতটি ওষুধগুলো বুকের কাছে ধরে আছে। আবার ছোট্ট রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল টুনটুনি।
তোমায় কষ্ট দিলাম। আজ যাই, তুমি আসবে একদিন।
কার জন্যে ওষুধ কিনলে?
ব্যথিত চোখ তুলে তাকাল টুনুটুনি। ধীরে ধীরে বলল, ওর অসুখ। ছ' মাস ধরে বিছানায় পড়ে আছে। যাই, কিছু মনে কোরো না।
আর দাঁড়াল না টুনটুনি।
আমি বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টুনটুনির চলে যাওয়া দেখলাম।
জোয়ারের জলে ভরে গেছে চারদিক, ধানক্ষেতের ভাঙা আল দিয়ে গলগল করে ঘোলাজল ঢুকে পড়ছে খেতে। বাম পাশে বিশখালি। সেই চেহারা আর নেই। বেশ রোগাটে, ভরা জোয়ারেও স্পষ্ট দেখা যায়। ওপারে চর জেগেছে, এদিকটা ভাঙছে। স্রোত এদিকটায় তাই প্রবল।
নদীর কিনার ধরে ঈষৎ উঁচু রাস্তা। বহুদিন পর গ্রামে ফিরছি আমরা। সামনে বাবা, পেছনে রমিজ, মাঝখানে আমি। রমিজের হাতে বাবার জুতো, ব্যাগ চায়ের ফ্লাক্স, খাবার-টাবার। একটু জোরে পা চালান চাচা–পেছনে থেকে রমিজ বলে ওঠে। বাবা আকাশের দিকে তাকালেন, আমিও। কালো মেঘে ছেয়ে আছে পশ্চিম আকাশ। ঠা া বাতাস শুরু হয়েছে উত্তর দিক থেকে। বাবা লম্বা-লম্বা পা ফেলে হাঁটছেন। তাঁর পাঞ্জাবির দুকোণ উড়ছে বাতাসে।
আরো একটি বাঁক সামনে। তারপর আমাদের পুরনো বসতভিটা। এখন অবশ্য কোনো চিহ্ন নেই। আশপাশে যারা তখন বাস করত তারাও উঠে গেছে নদী ভাঙনের শুরুতে। যারা সক্ষম– নদীর কিনার থেকে দূরে লোকালয়ের ভেতরে নতুন বাড়ি তুলেছে।
বাতাসের বেগ বাড়ছে ক্রমশ। সেই সঙ্গে বৃষ্টিও। এতক্ষণ একটু একটু পড়ছিল। তবে হাঁটতে অসুবিধা হয়নি। বাবা দু'একবার অসাবধানে হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে তারপর হিসেব করে করে পা দিচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি-বাতাসের দাপটে বাবা আবার দ্রুত পা চালালেন, আমরাও। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল ঘনঘন। কোথাও প্রচ শব্দে বাজ পড়ল। বুক কেঁপে উঠল আমার।
একটা বিশাল গাছের নিচে আশ্রয় নিলাম আমরা। সবাই ভিজে একাকার, বাবার পাজামা-পাঞ্জাবি শরীরের সঙ্গে লেপ্টে আছে। এত মেঘ-বৃষ্টি কোত্থেকে এল হঠাৎ। সহজে থামবে বলেও মনে হচ্ছে না। বিশাখালির ঢেউ ভেঙে পড়ছে দু'পাড়ে। ক্রুদ্ধ আক্রমণের ভঙ্গিতে একটার পর একটা ঢেউ এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। বাবা হঠাৎ বললেন–রঞ্জু, তোর মাকে মনে পড়ে? আমি বাবার দিকে তাকালাম। তার ভেতরটা ওপর থেকে কতটুকু আর চোখে পড়ছে! পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম।
তারপর বললাম–কখনো কখনো মনে পড়ে। তোমার মনে পড়ে না বাবা?
কোথাও সশব্দে বাজ পড়ল আবার। রমিজ লাফিয়ে ওঠে, ভয়ে। আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না বাবা। রমিজের দিকে তাকিয়ে বললেন, চলো এগোই। রমিজ বললো, ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আর এগোনো যাবে না চাচা। মরে যাব। ধমকে উঠলেন বাবা, বললেন, মরবি না। মানুষ সহজে মরে না।
বাবা আবার হাঁটতে লাগলেন।
বাঁক ঘুরতেই খালি-খালি জনমানবহীন, পরিচিত পটভূমিতে চোখে পড়ল সেই বাদাম গাছটি। নদীর দিকে নূয়ে আছে, জোয়ারের জল উঠে এসেছে গাছটির মাঝামাঝি। মাকে কবর দেয়া হয়েছিল ঐ গাছটির পাশেই। বিশখালির ভাঙন গ্রাস করেছে সবকিছু।
প্রচ ঝড়-বৃষ্টির ভেতর খুব দ্রুত পা চালাচ্ছেন বাবা; তাঁকে পেছন থেকে চিৎকার করে ডাকছি আমরা। বাবা শুনছেন না, ক্ষ্যাপার মতো এগিয়ে যাচ্ছেন। আমরা যতই ঝড়-বৃষ্টি অতিক্রম করে বাবার কাছে আসছি, বাবা ততই দূরে সরে যাচ্ছেন। আমি আর হাঁটতে পারছি না। রমিজ বসে গেছে মাটিতে। আমার পায়ের কয়েক জায়গা ছিঁড়ে গেছে, ব্যথা। তবু চিৎকার করে ডাকছি তাঁকে। বাতাসের সাথে, মেঘের গর্জন আর নদীর ঢেউয়ের সাথে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে আমার চিৎকার।
ক্লান্ত, অবসন্ন আমি ঝড়-বৃষ্টির ভেতর আরো কিছুদূর এগিয়ে এসে দেখি, সেই বাদাম গাছটির পাশ দিয়ে বাবা নিশ্চিন্তে বিশখালিতে নেমে যাচ্ছেন।

ইকবাল হাসানঃ একাধারে কবি, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। সত্তরের জনপ্রিয় উল্লেখযোগ্য কবিদের অন্যতম। সম্পাদনাও করেছেন বেশ কিছু। নিরলস লিখছেন আজও। জন্ম বরিশাল, ১৯৫২। পড়াশোনা, অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান)। বসবাসজার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বর্তমানে কানাডার টরেন্টো। পেশা, দেশে সাংবাদিকতা এবং বিদেশে কখনো ব্যবসা, কখনো স্রেফ শ্রমজীবী। প্রকাশিত গ্রন্থ - 'অসামান্য ব্যবধান' (কবিতা ১৯৮৬), 'মানুষের খাদ্য তালিকায়' (কবিতা ১৯৮৬), 'জ্যোৎস্নার চিত্রকলা' (কবিতা ১৯৯৫), 'দূর কোনো নক্ষত্রের দিকে' (কবিতা ২০০০), 'জলরঙে মৃত্যুদৃশ্য' (কবিতা ২০০৩), 'কপাটবিহীন ঘর' (গল্প ১৯৯৪), 'মৃত ইঁদুর ও মানুষের গল্প' (গল্প ২০০০), 'দূরের মানুষ কাছের মানুষ' (ব্যক্তিগত নিবন্ধ ২০০০), 'আশ্চর্য কুহক' (উপন্যাস ২০০২), 'শহীদ কাদরী কবি ও কবিতা' (সম্পাদনা ২০০৩), 'ছায়ামুখ' (উপন্যাস ২০০৪), 'প্রেমের কবিতা' (কবিতা সংকলন ২০০৪), 'কার্তিকের শেষ জ্যোৎস্নায়' (গল্প ২০০৪) ইত্যাদি।